

নিহিলিজম ও ইসলাম

মানব অস্তিত্বের সার্থকতার খোঁজে

মূল

ইউসুফ পন্ডার্স

অনুবাদ

ইরফান সাদিক

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান	৫
কে আমি, কেন লিখছি	৯
ভূমিকা	১৯

প্রথম অধ্যায়

নিহিলিজমের পরিচয়	২২
নিহিলিজম দর্শন	২৩
নিহিলিজমকে বোঝা কেনো জরুরি	২৫
উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের সাথে নিহিলিজমের প্রাসঙ্গিকতা	২৮
উচ্চতর মূল্যবোধ কি নিজেকে মূল্যহীন করে তোলে	২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিহিলিজমের কারণ ও প্রভাব	৩২
পোস্ট-ট্রুথ বা সত্য-উত্তর যুগের উত্থান	৩৩
সামাজিক শ্রানি	৩৫
অতিপ্রাচুর্য থেকে হতবিহ্বলতা	৩৭
রোগ হিসেবে নিহিলিজম	৪১
সত্য ও টেকনো-হিপনোসিস	৪৪
সমাজ, কর্তব্য ও দায়িত্ব	৪৬
চিড় খরা সমাজ	৫২
নৈতিকতা, অর্থবহতা এবং লিপ অব ফেইথ	৫৫
নিহিলিস্টিক আকুলতা	৬২

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা ৬৮

কী প্রতিবন্ধকতা?	৬৯
কেন ঐশী বিষয়ে বিশ্বাস করতেই হবে?	৭০
কোনো অভিজ্ঞতামূলক (Empirical) প্রমাণ কি নেই?	৭২
এত বেশি ঈশ্বর ও ধর্ম কেন?.....	৭৫
অতীতের প্রজ্ঞা	৮১
লিপ অব ফেইথ বিষয়ক আরো কিছু আলোচনা	৮৭
ভারসাম্যের খোঁজে	৯৩

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যান্টিডোট হিসেবে ইসলাম ৯৬

চূড়ান্ত ধাপ	৯৭
প্রতিরোধ এবং প্রতিকার	৯৮
সত্য-উত্তর ও জ্ঞানতাত্ত্বিক নিহিলিজম	১০১
হতশাবাদ কাটিয়ে ওঠা এবং আশাবাদের সৃষ্টি	১০৪
সংশয়বাদ ও নৈতিক নিহিলিজমের মোকাবেলা	১১০
ধৈর্য, পরিতৃপ্তি ও দৃঢ়তা	১১৮
কর্তব্য ও দায়িত্ব	১২৩
মানবজাতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি	১২৯
উপসংহার	১৪২

কে আমি, কেন লিখছি

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ হতাশায় ভুগছে। প্রবল এ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। Nihilism (অনর্থবাদ) নিয়ে আমার কাজকর্মের সময় অনেকেই আমার সাথে যোগাযোগ করে নিজেদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন। নিহিলিজম আমার জন্য খুব ব্যক্তিগত একটা বিষয়। শুধু আমিই যে এসবের মুখোমুখি হয়েছি, তা নয়; বরং খুব কাছের মানুষদেরকেও আমি দিনের পর দিন এমন কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি। পৃথিবীর দিকে তাকালে শুধুই শূন্যতা নজরে আসা, জীবনের নরকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, নিজের সব কষ্ট ও দুর্দশা চোখের সামনে দৃশ্যমান থাকা, পৃথিবীর কোনো অর্থ খুঁজে না পাওয়া কিংবা যাবতীয় দুঃখ ও দুর্দশাভোগের কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়ার অনুভূতি কেমন, তা আমি জানি। যা কিছুর মধ্য দিয়ে আমি জীবনে গিয়েছি, সে নির্মম অভিজ্ঞতাগুলোর কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে আমার অন্তরও হতাশায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। নিজের প্রতি প্রবল হতাশা ও সমাজের প্রতি তীব্র এক আড়ষ্টতা আর নিতে না পেরে আমি পালিয়ে যাই, লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাই বহু বছরের জন্য। মূলত আত্ম-উত্তরণের উদ্দেশ্যেই আমার লিখতে বসা। কেন আমি এমন বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি, তা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পাঠক যেন আমার লেখকসত্তার সাথে একাত্ম হতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই এ গল্প বলা।

আমার পরিচয়টা বলি। আমার জন্ম উত্তর ব্রিটেনে, ম্যানচেস্টারের সীমান্তবর্তী একটা ছোট্ট শহরে। আমার মায়ের বয়স যখন মাত্র তিন, তখন তিনি এখানে আসেন। বাবাও গ্লাসগো শহর থেকে এখানে আসেন মায়ের সাথে দেখা হওয়ার পর। সন্তান তাদের তিনজন—আমি সবার বড়, আমার পর এক ভাই এবং সবার ছোট আমাদের বোন। আমাদেরকে বড় করা হয়েছে ক্যাথলিক হিসেবে। আমাদেরকে ব্যাপটাইজ করানো হয়েছিল। আমরা হলি কমিউন নিয়েছিলাম। ক্যাথলিক স্কুল, চার্চ এবং পলিশ সানডে স্কুলে ছিল আমাদের নিয়মিত যাতায়াত। আমরা বড় হয়েছি কাউন্সিল স্টেটে। বোকাই যাচ্ছে—অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেশি সুবিধের ছিল না আমাদের।

আমাদের পরিবারে রোজগারের কাজ মূলত মা-ই করতেন। আমাদের জন্য মা অনেক কষ্ট করতেন। তিনি রেস্টুরেন্টে ডাবল শিফটে কাজ করতেন নিয়মিত; আমাদের কোনোকিছুর কমতি যেন না থাকে, সেদিকে মা খেয়াল রাখতেন।

বাবা ছিলেন অন্যরকম। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। পুলিশ তাকে কিছুদিন পর পর গ্রেফতার করে নিয়ে যেত এবং ছেড়ে দিত। এ চক্র চলতেই থাকত। বাবা বেড়ে উঠেছিলেন খারাপ পরিবেশে। এ কারণেই হয়তো তিনি আমাকে আর আমার ভাইকে ইম্পাত-কঠিন মানুষ হিসেবে বড় করতে চাইতেন। খুব ছোটবেলা থেকেই বাবা আমাদেরকে প্রচুর হরর সিনেমা দেখাতেন—The Exorcist, The Omen থেকে নিয়ে The Children of the Corn পর্যন্ত সব দেখে ফেলেছিলাম আমরা। যতক্ষণ তিনি ঘরে থাকতেন এবং হেরোইনে বুঁদ হয়ে থাকতেন না, পুরোটা সময় তিনি আমাদেরকে ‘সাহসী মানুষ’ বানাতে আশ্রয় চেষ্টা করেছেন।

মা ছিলেন পুরো উলটো। তিনি আমাদের ভীষণ যত্ন নিতেন; ভালোবাসা ও স্নেহে ভরিয়ে দিতেন আমাদের জীবন। স্বাভাবিকভাবেই এতে ঘরে সমস্যা তৈরি হত। বাবা মনে করতেন মা আমাদেরকে একেবারে দুর্বল করে বড় করছেন। পৃথিবী ভয়ঙ্কর স্থান; এখানে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ‘পুরুষ’ হতে হবে।

হেরোইন ওভারডোজে বাবা যখন মারা যান, আমার বয়স তখন নয় বছর। তার ঠিক তিন দিন পরই আমার ছোট বোনের জন্ম হয়। ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিল দিনটি আমার জীবনস্মৃতিতে একটি অবিস্মৃত দাগের মতো খোদাই হয়ে থাকে। এ দিন আমার বাবা মারা যান এবং ঈশ্বরের সাথে আমার সমস্যাও প্রথম শুরু হয়। সেদিন আমি আর আমার ভাই বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান ধরে ছিলাম। স্কুল খোলা ছিল। কিন্তু সবাই আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিল। নিচতলা থেকে অনেক হৈচৈ শোনা যাচ্ছিল। কাঁথার নিচে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। অনেক কষ্টে আমরা হাসি আটকে রাখি। স্কুলে যেতে হবে না, এই আনন্দে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। গ্লাসগো থেকে আমাদের আত্মীয়স্বজনরা এসেছিল। তাদের সাথে সময় কাটানোর কথা ভেবেই মনটা খুশি হয়ে যায়।

নয়টা বেজে গেছে। স্কুলে যাওয়ার আর প্রশ্ন নেই। আমি ও আমার ভাই এক-গাল হাসি নিয়ে নিচে নেমে আসি। সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখি আমাদের বাসায় অচেনা অনেক মানুষ। পুলিশ, প্যারামেডিক, আমাদের প্রতিবেশী—অনেকেই। আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝে উঠতে পারি না—কী হচ্ছে। মাকে দেখি কাঁদছেন।

লিভিং রুমে কী হচ্ছে, তা যেন না দেখি তাই এক আন্টি এসে আমাদেরকে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। আমরা সিঁড়িতে বসেছিলাম। মা এদিকে শুধু কেঁদেই যাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে কিছু একটা বলতে চেয়েও কান্নার জন্য বলতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে একজন আমাদের জানাল—তোমাদের বাবা মারা গেছে।

আরও অনেক কিছুই হয়তো বলেছিল, কিন্তু আমার শুধু এতটুকুই মনে আছে। কী করা উচিত, কী বলা উচিত, কিছুই তখন আর বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মা বসে ছিলেন খুবই বিষণ্ণ অবস্থায়। এ খবরটা কীভাবে নেওয়া উচিত, সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা। শুনলাম গ্লাসগো থেকে আমাদের এক আঙ্কেল আসছেন আমাদেরকে স্কটল্যান্ড নিয়ে যেতে। জামাকাপড় গুছিয়ে ফেলতে হবে।

আমি প্রস্তুত হতে গেলাম। জামাকাপড় গোছানোর সময় আমি একাই ছিলাম। কী করব, কী বলব, তা নিয়ে তখন এত চিন্তা ছিল না। জীবনের কঠিন বাস্তবতা চোখের সামনে ধরা দিতে লাগল। ঈশ্বরের ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলাম অনেক। বারবার অভিযোগ করছিলাম—কেন তিনি আমাদেরকে এমন এক অবস্থায় এনে ফেললেন। আমার বাবা মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। এ বইটি লেখার সময় আমার বয়সও তেত্রিশের কাছাকাছি। আমি সেদিন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না—কেন এই বয়সে বাবা মারা গেলেন।

বাবাকে শায়িত করা হয় স্কটল্যান্ডে আমার দাদির পাশে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাবার ঠান্ডা দুটো হাত শক্ত করে ধরে আমি একান্তে কিছু কথা বলেছিলাম। আমি খুব করে তাকে আবার কোনোভাবে জেগে ওঠার অনুরোধ করেছিলাম। কপালে চুমু দিয়ে তাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলাম। মৃতদেহে সাধারণত এক ধরনের কেমিক্যাল দেওয়া হয়। বাবার দেহ থেকে সেই কেমিক্যালের অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছিল। আমার কোনোভাবেই তার থেকে দূরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অনেক মানুষ এসে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলাম বাবার লাশের পাশে।

পাদরি এলেন বক্তব্য দিতে। মা আমার ছোট বোনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবার মৃত্যুর কিছু পুরেই তার জন্ম। বাবার কফিনটা লোকেরা ধীরে ধীরে কবরে নামাচ্ছিল। এ কাজ না করার জন্য আমি চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে তাদেরকে অনুরোধ করছিলাম। প্রতিটা রঙ, মানুষ, স্থান ও আবেগ আমার খুব পরিষ্কারভাবে মনে আছে। সবই ছিল কঠিন এক অভিজ্ঞতা। তার পরের বছরগুলোতে আমাদের পরিবার ও

কাছের বন্ধুদের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, ওষুধের অপব্যবহার ও বার্ষিক্যের কারণে আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়।

একটা সময় আমরা চার্চে যাওয়া বন্ধ করে সেকুলার স্কুলে যাওয়া শুরু করি। ধর্ম থেকে আমি অনেক দূরে সরে যাই। মিডিয়া ও গেইমসে ধর্মের নানা বিষয়কে তচ্ছল্য করা হত, আমি সেসবেরই বৃদ্ধ হয়ে থাকতাম। কিছু বদ্ধ উন্মাদ লোক বজ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে বাইবেলের নানা উক্তি চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে মানুষকে ধর্মগল্প শোনাচ্ছে— আমার মাথায় ধার্মিক লোকদের শুধু এ চিত্রই ছিল। বাবার মৃত্যুর পর যত সময় যাচ্ছিল ততই আমি ঝুঁকে পড়ছিলাম নাস্তিকতার দিকে। ধর্ম সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তৈরি হয়েছে—এমন বিশ্বাস আমার মাথায় বদ্ধমূল হয়ে যায়।

ধর্ম যে বদ্ধ উন্মাদ লোকদের জন্য—এ চিন্তা আমার মাথায় আরও ভালোভাবে বসে যায় ২০০১ সালের নাইন-ইলেভেন হামলার পর। খবরে এ হামলার রিপোর্ট দেখে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। কেউ এমন একটা কাজ কীভাবে করতে পারে? কেন এত বড় জঘন্য একটা কাজ কেউ করবে? আমি নিশ্চিত হয়ে যাই—ঈশ্বর বলতে কেউ নেই। জীবনটা সে বিশ্বাসেই চালানো শুরু করি।

তখন থেকেই আমার প্রচণ্ড বস্তুবাদী জীবনের সূচনা হয়। কাজ করি আর নিজের শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য টাকা জমাই। গাঁজা টানা, মেয়েবাজি, হাজার ডলারের কাপড় ও আফটারশেইভ কেনা—কিছুই যেন বাদ যায় না। সমাজের নানা অংশ থেকে উঠে আসা বন্ধুদেরকে নিয়ে আমার অনেকগুলো গ্রুপ ছিল। আমি হয়ে উঠি তাদের মধ্যমণি। আমাদের জীবন ছিল—কাজ করা আর খেলা, কাজ করা আর খেলা, কাজ করা আর খেলা।

একটা সময় আমার কিছু মুসলিম বন্ধু হয়। ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে আমার আবার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কুরআন পড়া ও আমার মুসলিম বন্ধুদের সাথে নানা আলোচনার পর আমি নাস্তিকতা থেকে কিছুটা সরে এসে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হয়ে যাই। কিন্তু ধর্মের প্রতি বিরক্তি কোনোভাবেই যেন মন থেকে যাচ্ছিল না। একটা সময় আমি হয়তো বলেছিলামও যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকার ভালো রকম সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সে সময়টাতে আমি ইসলামের মতো ধর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চাচ্ছিলাম না। এমনিতেই ইসলামে অনেক বিধিনিষেধ; সাথে ইসলাম ধর্মটাই তখন আবার বেশ বিতর্কিত। জীবনে আমার অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। ইসলাম গ্রহণ করলে ওগুলো শুধু স্বপ্নই থেকে যেত। তাই ইসলাম গ্রহণের চিন্তা ঘুণাক্ষরেও আমার মাথায় আসেনি।

আমি আমার বস্তুবাদী জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলাম সত্য; কিন্তু এ জীবন যে কতটা নিরর্থক, তা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। বিজ্ঞান আমাকে পুলকিত করত। আমার পছন্দের টিভি শো ছিল ‘Through the Wormhole’ কিন্তু এসবকিছু মহাবিশ্বের বিশালতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের মুগ্ধতাই শুধু বাড়িয়ে দিচ্ছিল। শুধু তাই না, এ বিশাল মহাবিশ্বে আমি কতটা গুরুত্বহীন—তা-ও বুঝতে পারছিলাম। জীবনটা উথাল-পাথাল হয়ে যাচ্ছিল। আমি ও আমার আশেপাশের মানুষদের সবার জীবনেই নানা কষ্ট, বাধা, ব্যথা ও ট্রমা জর্জরিত ছিল। প্রতিদিনই খবরে দেখাচ্ছিল—বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সব ঘটনা। আমার মাথায় শুধু একটা প্রশ্নই যেন বার বার ঘুরপাক খেত—‘এসব কিছুর মানে কী?’

একঘেয়ে জীবনে আমার বিষণ্ণতা দানা বাঁধছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মেয়ের মতো। রাজ্যের অসন্তুষ্টি যেন ঘিরে ধরছিল আমাকে। পৃথিবীর কোনোকিছুই যেন আমাকে কোনো সমাধান দিতে পারছিল না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গও আর ভালো লাগছিল না। প্রতিদিন সকালে উঠে সেই একই বিরক্তিকর ও হতাশার দিন। আমি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিছু টাকা জমিয়ে আমি এশিয়ায় ১৮ মাসের জন্য ঘুরতে চলে যাই। আমার যা কিছু ছিল, সব বিক্রি করে দিই। কাঁধের একটা ছোট্ট ব্যাকপ্যাক এবং ভেতরের জিনিসগুলো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

এ সময়টাতে আমি বেশ কিছু বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে অবস্থান করি, কাজ করি। পৃথিবীর নানা জায়গার নানা ধর্মের মানুষের সাথে আমার দেখা হয়। তাদের সাথে জীবনের অর্থ, ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তখন আমার না ছিল কোনো দায়িত্ব, না ছিল যাওয়ার কোনো জায়গা। যেখানে থাকতে গিয়েই আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম, গাড়িবোচকা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতাম।

১৮ মাস ধরে ক্রমাগত অভিযানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। ঊষঃপ্রধান দ্বীপে আমি একটা বার চালিয়েছি, কাজ করেছি বাঘ, সিংহ ও ভালুকের সাথে। পূর্ণিমার রাতে পার্টি (Full moon party), গভীর বনে ক্যাম্পিং, স্কুবা ডাইভিং, কাউন্সারিং—কী করিনি! আমার এই ১৮ মাসের অভিজ্ঞতার সামনে পূর্বের পুরো জীবনটা ছিল হীন।

অভিজ্ঞতাগুলো যত সুন্দরই হোক না কেন, অন্তরের গভীরে বারবার জেগে ওঠা নিহিলিজমের কোনো নিরাময় হচ্ছিল না। স্বর্গ চোখের পলকেই নরক হয়ে যাচ্ছিল। কোনো একটা স্থানকে অনেক ভালো লেগে গেলেও পরক্ষণেই তার কোনো কদর্বতা আমার আমার নজরে পড়ছিল। আমি অনেক ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি, কথা বলেছি ভয়ঙ্কর সব লোকদের সাথে।

জীবন ও পৃথিবীর জটিলতাগুলো একে একে ধরা দিচ্ছিল আমার চোখে। ভালো, খারাপ অথবা নোংরা—দেখে ফেলেছি আমি সবই। প্রবলভাবে চেষ্টা করছিলাম সবকিছুর অর্থ খুঁজে বের করতে। জীবনের উদ্দেশ্য কী—এ ব্যাপারে জগতের বিপুল ধর্ম ও আদর্শের নানা তথ্য আর মতামত আমার মাথায় গিজগিজ করত। হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় এল—এত তথ্য তো আমি মরণ পর্যন্তও বুঝে শেষ করতে পারব না। এটা শুধু আমার জন্যই না, পুরো মানবজাতির জন্যই বেশ দুঃসাধ্য। আমি একা কীভাবে সব তথ্য ঘেঁটে সত্য খুঁজে বের করব? খুব বেশি বিশৃঙ্খলা, খুব বেশি প্রবাহ। কোনো মুহূর্তে কাউকে বেশ অসাধারণ মানুষ মনে হলো, তো পরমুহূর্তেই তার খুব কদর্য কোনো রূপ বের হয়ে এল। ভয়ঙ্কর যেসব বিষয় আমি দেখেছি, সেগুলোতে আক্রান্তও হয়েছি বার বার। সে জীবনে আমি এত কিছু সহ্য করেছে যে, আপনি সহানুভূতি অনুভব না করে পারবেনই না। যখনই মনে হয়েছে অন্তরে বল পাচ্ছি তখনই এমন কিছু হয়েছে, যা সব আত্মবিশ্বাসকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

একসময় আমার জমানো টাকা শেষ হয়ে যায়। অগত্যা ঘরে ফিরে আসতে হয়। হতাশা আবারও জাপটে ধরে। এতদিন কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না, ছিল না কোনো দায়িত্ব। হঠাৎই এসে পড়ি এই ‘স্বাভাবিক’ দুনিয়ায়। মানিয়ে নিতে ভীষণ কষ্ট হয়। ভয়াবহ হতাশা আমায় চেপে ধরে, সমাজের প্রতি তীব্র ভীতি আমাকে ঘরে বসিয়ে দেয়। সব বন্ধুর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। ডিলিট করে দিই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সব ক’টা একাউন্ট। এক অদৃশ্য খোলসে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। ডকুমেন্টারির পর ডকুমেন্টারি চলতে থাকে আমার ল্যাপটপে। মানবতার জঘন্যতম উদাহরণগুলো কোনো এক অজানা আগ্রহে বার বার দেখতে থাকি। ইন্টারনেটের অন্ধকার জগৎ আমায় হাতছানি দেয়। মানুষের অমানুষিক সব কাজ দেখে প্রশ্ন জাগে—হচ্ছেটা কী? কেন এসব হচ্ছে? মানে কী এসবের?

পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি ধীরে ধীরে ক্রমশ ডুবে যেতে থাকি এক অতল বিহ্বলতায়। আমার নিয়ন্ত্রণ আর আমার কাছে নেই। বিহ্বলতার চূড়ান্ত গহ্বরে যখন আমি পৌঁছে যাই, জীবনটা ডুবে যায় ঘন কালো আঁধারে; দৃশ্টিভ্রম ও কষ্টের সাথে যুক্ত হয় চরম একাকিত্ব। শেয়ার করার মতো দুনিয়ার বৃকে যখন কেউই নেই, ঠিক তখনই আমার মনে পড়ে যায় নানা মানুষের সাথে ধর্ম ও ঈশ্বরকে নিয়ে বলা সব কথা। সেই চরম দিশেহারা মুহূর্তে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় নিরত হই, অথচ তার অস্তিত্বে আমি তখনো বিশ্বাসী নই। আমি সাধারণভাবেই বলি—যিনিই ওপরে আছেন, যিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, অস্তিত্বের চূড়ায় যার অবস্থান,

নিহিলিজম দর্শন

মৌলিক চাহিদাগুলো (যেমন- খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থান) মানুষের জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তার চেয়েও তীব্রভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। অথচ নিহিলিজম বলে, মানুষের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। ফলত নিহিলিজম অনিবার্যভাবে মনুষ্যত্বকেও অস্বীকার করে বসছে। নিহিলিজম নানা ভয়ঙ্কর সব উপায়ে মানুষের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই এর ভিত্তিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে এ রোগের ব্যাপারে ভালোভাবে জানা ও বোঝা ছাড়া গতি নেই।

নিহিলিজম অনেক রূপেই ধরা দিতে পারে। সাধারণভাবে বললে নিহিলিজম মানে হলো—কোনোকিছুর কোনো অর্থ, উদ্দেশ্য নেই মনে করা এবং ব্যক্তির ঐতিহ্যগত নৈতিকতার অবক্ষয় হওয়া।^[১] ডেভিড ম্যাথেসনের (David Matheson) মতে, নিহিলিজম মানে হলো ‘সবদিক বিবেচনা করেও কোনো জীবনই যাপন করার কোনো মানে নেই’ এমন বিশ্বাস রাখা।^[২] রাফ ডোনেলসন নিহিলিজমের আরও সুনির্দিষ্ট রূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—জীবন হলো ‘অর্থহীন ও শূন্য’ এবং ‘যাপনের অযোগ্য’ এমন বিশ্বাস রাখা।^[৩] ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, নিহিলিজম একটা নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি; আশা-ভরসার কোনো স্থান এখানে নেই।

ফ্রেডরিখ নিটশেকে (Friedrich Nietzsche) বলা হয় নিহিলিজম দর্শনের জনক। তার মতে নিহিলিজমের মৌলিক দাবি হলো—‘জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, “কেন” প্রশ্নটার কোনো জবাব নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘নিহিলিজম হলো এমন এক উচ্চতর মূল্যবোধ, যা নিজেই নিজেকে মূল্যহীন করে দেয়।’^[৪]

[১] Britannica, The Editors of Encyclopaedia. ‘Nihilism’. Encyclopedia Britannica, 13 March 2020

[২] Matheson D., ‘Incoherence of Soft Nihilism’, Think, 47/16, (2017) 127-135 (p.127)

[৩] Donelson R., ‘The Nihilist’, The Pragmatism and Prejudice of Oliver Wendell Holmes Jr., Edited by Vannatta S., (Maryland: Lexington Books, 2019) p. 3

[৪] Nietzsche F., The Will to Power, (London: Penguin Group, 2017) p. 15

সুতরাং ‘জীবনের লক্ষ্যহীনতা’ ও ‘যে উচ্চতর মূল্যবোধ নিজেই নিজেকে মূল্যহীন করে দেয়’—এ দুটো বিষয় হবে আমাদের বইয়ের প্রথম অংশের মূল আলোচনা।

আলোচনার আরও গভীরে ঢোকান আগে কেন নিহিলিজম নিয়ে আলোচনা করা দরকার, তা বোঝা উচিত। আমার কাছে কেন এটা আগ্রহের বিষয়, তা তো ‘কে আমি এবং কেন লিখছি?’ অধ্যায়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আসি কেন আপনাদেরও বোঝা প্রয়োজন তা নিয়ে।

নিহিলিজমকে বোঝা কেনো জরুরি

আমাদের কেন এ বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা আগে বোঝা উচিত। কেন আমরা এর পেছনে এত সময় নষ্ট করব? এর উত্তর এক বাক্যে আমি বলব—নিহিলিজমের অনুভূতি আপনার জীবনের কোনো না কোনো সময় আঘাত হানবেই। হয়তো ইতিমধ্যেই হেনেছে। যদি আল্লাহ আপনাকে এ অনুভূতি থেকে রক্ষা করেও থাকেন, আপনার চেনা কিংবা ভালোবাসার কেউ এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হয়তো আপনি নিহিলিজম দ্বারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু ‘নিহিলিজম’ শব্দটার ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নেই, তাই ভালোভাবে নিজের রোগটা বুঝে উঠতে পারেননি। নিহিলিজম সাধারণ কোনো শব্দ না। সাধারণ মানুষের মুখে বা প্রাত্যহিক আলোচনায় আমরা এ শব্দ শুনি না। এ বইটা পড়ে হয়তো আপনার মনে হবে, হায়, এ সমস্যায় তো আমিও পড়েছিলাম। এ আলোচনার পরে আপনারা ইনশাআল্লাহ ঠিকই বুঝতে পারবেন, কেন আমাদের সবার এ ব্যাপারটা নিয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি। এ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিলে কীভাবে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত হুমকির মুখে পড়ে।

ফ্র্যাঙ্ক দার্শনিক আলবের কামু (Albert Camus) তার *The Myth of Sisyphus* বই-এর শুরুতেই বলেন—‘মারাত্মক একটি দার্শনিক সমস্যা হলো আত্মহত্যা।’^[১] আর্থার শোপ্যানহাওয়ার (Arthur Schopenhauer) বিখ্যাত ছিলেন তার নৈরাশ্যবাদী চিন্তার জন্য। তিনি জীবনের অর্থহীনতা নিয়ে কিছু অ্যান্টি-ন্যাটালিস্ট^[২] মন্তব্য করেছিলেন, যার মূলকথা হলো—মৌলিকভাবে জীবনেরই কোনো অর্থ নেই, তাই এটি যাপনেরও নেই কোনো অর্থ। তার মানে এই না যে, তিনি সমাধান হিসেবে আত্মহত্যার কথা বলেছেন। তিনি পরিস্কারভাবেই বলেছেন, আমাদের সন্তান জন্মদান করাই উচিত নয়।

[১] Camus A., *The Myth of Sisyphus*, (London: Penguin Books, 2005), p 1.

[২] এমন বিশ্বাস যে, জীবন শুরু করারই কোনো অর্থ নেই; তাই সন্তান গ্রহণ করা অনৈতিক কাজ।

মানুষ যদি সন্তান প্রসবের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে নিত, তাহলে কি মানবজাতি টিকে থাকত? (স্বাভাবিকভাবেই এর উত্তর, থাকত না।) কারণ, একজন মানুষ হয়তো এতটুকু সহানুভূতিশীল হতো যে, নিজের সন্তানের ওপর সে জীবনের দুঃখ-কষ্টের বোঝা আর অভিশাপ চাপিয়ে দিতে চাইত না। এভাবে করে ঠান্ডা মাথায় সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হত যে—সন্তান প্রসব করা উচিত নয়।^[১]

শোপ্যানহাওয়ারের কাজ নিটশের চিন্তার ওপরে ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। নৈরাশ্যবাদ ও নিহিলিজম নিয়ে নিটশের যে লেখাগুলো আছে, সেগুলো থেকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যায়। কিন্তু আমরা শুধু দুইজন দার্শনিকের চিন্তার ওপরেই আমাদের আলোচনার কাঠামো সাজাতে পারি না। কেউ যুক্তি দেখাতেই পারে যে, দর্শনের জগতে ঘুরে বেড়ানো স্বয়ং দার্শনিক ধারণাগুলোই একটা পর্যায়ে নিহিলিজমে রূপ নেয় এবং জীবনবিরোধী মূল্যবোধ তৈরি করে (অ্যান্টি-ন্যাটালিস্ট বা আত্মহত্যাপ্রবণতা অথবা দুটোর মাধ্যমেই নিহিলিজম প্রকাশিত হয়)। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (The World Health Organisation) এক প্রবন্ধে বলছে, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। আর প্রত্যেকটা সফল আত্মহত্যার পেছনে আছে অনেক ব্যর্থ আত্মহত্যা-চেষ্টার গল্প।^[২] ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, প্রতি বছর ব্রিটেনের লিডসের মতো একটা শহরে যে পরিমাণ মানুষ থাকে, সে পরিমাণ মানুষ আত্মহত্যা করে মারা যায়। আর এই আকারের আরও দু-চারটা শহরের মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না। এর বাইরেও অসংখ্য মানুষ আছে, যারা খুব করে চায় আত্মহত্যা করতে, কিন্তু তাদের সাহস হয় না। আত্মহত্যা করার সাহস করে উঠতে না পারলেও তারা তো জীবনটাকে অর্থহীনই মনে করছে। এজন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভাবনাটা তারা একেবারে ফেলে দেয়নি। বিশ্বের অনেক দেশে তথ্যের মান ও সংগ্রহে নানা সমস্যা আছে। ধরে নেওয়াই যায় যে, এ সংখ্যাটা আমাদের জানার চেয়েও অনেক বেশি। অজানা জরিপ বাদ দিলেও জানা সংখ্যাটাই অনেক বড়, অনেক ভয়াবহ। হতাশা, আত্মহত্যা, নিহিলিজম এ তিনটি সমস্যার মূল একটাই—জীবনকে উদ্দেশ্যহীন মনে করা, যাপনের অযোগ্য মনে করা।

[১] Schopenhauer A., The Essays of Arthur Schopenhauer: Studies in Pessimism, Vol. 4, Trans. By T. Bailey Saunders, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2005), p. 7

[২] World Health Organisation (WHO), 'Suicide', WHO, 2 Sept. 2019,

মার্টিন হাইডেগার (Martin Heidegger) তার Being and Time বইতে অন্য প্রাণীদের থেকে মানুষ (Dasein) কেন ভিন্ন, তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্বই তার জন্য একটা সমস্যা।^[১] শুধু মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে কী হবে, কীভাবে হবে। সে প্রকৌশলী, শিল্পী, আইনজীবী, ডাক্তার নাকি দার্শনিক হওয়ার লক্ষ্যে পরিশ্রম করবে? মানুষকে চিন্তা করতে হয়, তার ভবিষ্যৎ সত্তা নিয়ে। সে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেটা অর্জনে কঠোর সাধনা করতে থাকে। যে জিনিস তার কাছে আদর্শ মনে হয়, তাকে সে অন্তর থেকে টেনে বের করে বাস্তব করে তোলে। অন্য প্রাণীদের এত চিন্তা নেই। সিংহ, পাখি, মাছ ও পোকামাকড় কী হতে চায়, তা নিয়ে চিন্তা করা লাগে না। তারা যা, তা-ই থাকবে। যা করার, তারা করে। তাদের তাই অস্তিত্ব-সংকট তৈরি হওয়ার তেমন কোনো কারণও নেই, সুযোগও নেই।^[২] অন্যদিকে একজন মানুষ যা চায়, সবই পেতে পারে, তার সব প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ হয়ে উপচে পড়তে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হতাশ হতে পারে, আত্মহত্যা করতে চাইতে পারে। মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে চিন্তা করতেই হয়। আমরা সবসময় বেঁচে থাকার কারণ খুঁজি শুধু ‘একটি উদ্দেশ্য দরকার’—এজন্য নয়, বরং এটা আমাদের মনুষ্যত্বের একটি মৌলিক অংশ। ঠিক এ কারণেই নিহিলিজমের আলোচনা জরুরি, আমাদের এ ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত।

[১] Heidegger M., Being & Time, (Oxford: Blackwell Publishing LTD, 2016), page 68.

[২] অস্তিত্বের সংকট হলো জীবনের উদ্দেশ্য থাকার বা অর্জনের প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বুঝতে না পারা। এর মধ্যে অন্যতম হলো জীবনের উদ্দেশ্য বোঝা সামর্থ্যের বাইরে এমন মনে হওয়া।

উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের সাথে নিহিলিজমের প্রাসঙ্গিকতা

‘মূল্যবোধ কী’—আমরা প্রথমে জানব, তারপর ব্যাখ্যা করব উচ্চতর মূল্যবোধগুলো কীভাবে নিজেরাই নিজেদেরকে মূল্যহীন করে দেয়।

অনেকেরই এ ব্যাপারটা বুঝতে সমস্যা হয়। মূল্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন কিছু, যার আপেক্ষিক দাম, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আছে।^[১] তবে বস্তুর যেমন দাম থাকে, তেমনই দর্শন ও নীতিরও থাকে দাম। ফলে উচ্চতর মূল্যবোধ বলতে আমি বোঝাচ্ছি—এমন কিছু নীতি ও বিশ্বাস, যেগুলোকে ব্যক্তি বা সমাজ সবচেয়ে দামী বা মূল্যবান হিসেবে দেখে।

মানুষ উচ্চতর মূল্যবোধগুলোকে এতটাই গুরুত্বের চোখে দেখে যে, তারা সমাজে সেগুলোকে কয়েম রাখাকে নিজেদের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব মনে করে; সেগুলোকে কেন্দ্র করেই ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সেগুলোর মহৎ মূল্য এবং উপযোগিতা আছে বলে কঠোরভাবে বিশ্বাস করে। উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় ধর্মকে। মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ হলো একটি সর্বস্বীকৃত উচ্চতর মূল্যবোধ। একজন নাস্তিক হয়তো ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে দেখে। ব্যক্তি ও প্রেক্ষাপটভেদে এ উচ্চতর মূল্যবোধগুলো নানা দিক থেকে নানা মাত্রায় প্রকাশিত হতে পারে। একে একটি পিরামিড হিসেবে দেখা যায়। সবার ওপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ধারণাগুলো, সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণগুলো সবার নিচে।

[১] Merriam-Webster, ‘Value’, Merriam-Webster Dictionary,

উচ্চতর মূল্যবোধ কি নিজেকে মূল্যহীন করে তোলে

‘খ্রিস্টানপ্রধান পশ্চিমা বিশ্বে’ উচ্চতর মূল্যবোধের (যা নিজেকে মূল্যহীন করে দেয়) উদাহরণ হতে পারে ‘সত্য’ (Idea of truth)^[১] সত্যকে সেখানে এত ওপরে তোলা হয়েছিল যে, একটা সময় যে তাকে ওপরে তুলেছিল, তাকেই সে বাতিল করে দিতে শুরু করে। তবে বোঝার বিষয় হলো—এটি কীভাবে উচ্চতর মূল্যবোধ?

খ্রিষ্টধর্ম আসার আগে ইউরোপের বেশিরভাগ মানুষ ছিল মুশরিক। মানুষ নানা দেবতার পূজা করত। সেসব দেবতাদের ঘিরে বর্ণিত হয়েছে বহু ঘটনা। সেসময়ের মানুষের সৎ জীবনের উদাহরণ থাকলেও, মারাত্মক বিপর্যয়ও ছিল অনেক। গ্রিক দেবতা ‘যিউস’ যেমন নারী-ধর্ষণের জন্য কুখ্যাত ছিল; এছাড়াও প্রাচীন দেবতা ও মহাপুরুষদের মিথ্যাবাদিতার ঘটনা অসংখ্য।^[২] প্রাচীন মুশরিক ধর্মগুলোতে ষোঁকাবাজি, মিথ্যা ও প্রতারণা এত বেশি যে, সফ্রেটিস নিজেকে এ ধরনের বিষয়গুলো সেম্বর^[৩] করতে বলেছিলেন। প্লেটোর Republic গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায়টির প্রারম্ভিক লেখায় প্লেটোর ডায়ালগের ব্যাপারে সম্পাদক নিচের মন্তব্যটি করেন—

‘ভুলে গেলে চলবে না, গ্রিকদের কিন্তু বাইবেল ছিল না। বাইবেল আমাদের কাছে যেভাবে ধর্ম ও নৈতিকতার উৎস, গ্রিকদের কাছে নৈতিকতার উৎস ছিল তাদের কবিদের কাব্য। আপনার যদি মনে হয়

[১] খ্রিস্টানপ্রধান পশ্চিমা বিশ্ব বলার মানে হলো পশ্চিমা বিশ্ব এখন আর খৃস্টান নেই, সেকুলার হয়ে গেছে। এখানে যে বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাদের উৎস, ইতিহাস এবং ভিত্তি তুলে ধরার জন্য আমরা খ্রিস্টান শব্দটি ব্যবহার করছি। আমি স্বীকার করি যে ‘পশ্চিমা বিশ্ব’ বলতে এখন ভৌগোলিক দিকনির্দেশনা সেভাবে বোঝায় না। আধুনিক যুগের শুরুতে ব্যাপক দখলদারিত্বের মাধ্যমে যে সাম্রাজ্য ‘পশ্চিমা বিশ্ব’ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাঁর অবশিষ্টাংশকেই আমরা বোঝাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়া পূর্বে হলেও একে পশ্চিমাদের মধ্যেই ধরা হয়।

[২] Shilling A., ‘Famous Liars in Greek Mythology’, Classroom synonym,

[৩] তসম্বর (censor) বলতে বোঝায়—কোনো তথ্যগত নির্মানকে নিরীখ করে